মানবাধিকার রক্ষা রাষ্ট্রের দায়

বন্ধ কারখানার শ্রমিকের মৃত্যু, বন্ধ চা বাগানে অনাহারে মৃত্যু...এ সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নয়? প্রশ্ন তুললেন নব দত্ত

১০ ডিসেম্বর, ২০১৫, ০০:২০:০০

ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক।

বাবা ডাক্তার। অঞ্চলের পরিচিত মানুষ। তখনকার কারখানায় কয়েকশো শ্রমিক কাজ করলে নিয়ম মেনে স্থায়ী, অস্থায়ী ডাক্তার থাকত। ছেলে দু'জন ড্রাফ্টসম্যান ডিপ্লোমাধারী, চাকরি জুটল কামারহাটির বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ছোট ছেলে মানু এলাকায় সিপিএম করতেন। কারখানা বন্ধ হল। তেমন কোনও কাজ জুটল না। একমাত্র মেয়ে রক্তাল্পতায় ভুগছে। পয়সার অভাবে ওষুধ জোটে না, লেখাপড়া

বন্ধ। এক বৃষ্টির দিন ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ঘরের চারদিকে মশারির মতো করে প্লাস্টিক টাঙানো। ছাদ ফুটো হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে বাড়ির চারধার। জঙ্গলে পরিণত। মানু নিজে অসুস্থ। সেলাইয়ের কাজ করতেন, তা-ও আজকাল জোটে না। কারণ, পা-ই যে চলে না। অসহ্য এক কষ্ট। নিদারুণ দারিদ্র। সত্যিই কী রকম যেন। বেশি ক্ষণ দেখা যায় না। ঘরে টাঙানো ড্রাফ্টসম্যানের প্রতীক সেই 'টি' এবং লেনিনের অর্ধেক-মানুষ ছবি। অনিবার্য মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে এলাম।

নিমাই। সারা শহরটা সাইকেলে যাতায়াত। সোনার দোকানে ঘুরে ঘুরে মোম বেচে। দিনে সাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা রোজগার। রাতে এক সহৃদয় মানুষের ঘরের বারান্দায় শোওয়া। আমার কাছে আসতেন। ওঁর পি এফ-এর যে টাকাটা কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন, ওঁর মনে হয়েছে সেটা পরিমাণে কম। মেটাল বক্স কারখানায় নিমাই কাজ করতেন। দিনের পর দিন পিএফ-এর টাকা কর্তৃপক্ষ কেটে নিয়েও জমা দেননি। অবশেষে কোর্টের নির্দেশে সেই টাকা দিলেও হিসেবের গরমিল করেছে। ইউনিয়ন কিছু বলেনি। কিন্তু অল্পশিক্ষিত নিমাই নাছোড়বান্দা। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টে মামলা করে কী ভাবে যে নিমাই এটা প্রমাণ করলেন সত্যিই কর্তৃপক্ষ হিসাবে কারচুপি করেছেন, সে এক অসম লড়াইয়ের অনন্য কথা!

মহম্মদ ইউসুফ। গৌরীপুর জুট মিলে কাজ করতেন। টানা ছত্রিশ বছর কাজ করেছেন। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, গৌরীপুর বাজারে সেলাই মেশিন নিয়ে বসতেন। টুকটাক রিফু সেলাইয়ের কাজ করেন। চোখে কম দেখেন। ভেবেছিলেন পয়সা হাতে এলে ডাক্তার দেখাবেন। এর মধ্যে গৌরীপুর বাজারে আগুন লাগল। সেলাইয়ের কাজ গেল। বিনা চিকিৎসায় চোখ দুটো একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। বউ আমিনা বিবি কলকাতায় বাবুর বাড়ি কাজ করতে যান। তিনিও আর পারেন না। অন্ধ ইফসুফ, তাঁর বিবি আর মেয়ে— তিন জনে মিলে টায়ার ছাড়ান।

এ রকম অজস্র বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশার ছবি নিয়ে দেখা করেছিলাম রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রয়াত বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বললেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের আইনি ব্যাখ্যায় এ সব নাকি পড়ে না।

বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা বাগান।

ডুয়ার্সের হান্টাপাড়া চা বাগানের লোটো ঘাড়িয়া জন্ডিসে ভুগছিলেন। বিনা চিকিৎসায় লোটোর মৃত্যু হয়েছে। ক'দিন আগে, ১৭ নভেম্বর বীরপাড়া চা বাগানের দু'নম্বর বিজলি লাইনের বাসিন্দা বুদি কুজুরের শরীরের একটা দিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। তাঁকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অবস্থার আরও অবনতি হয়। ডাক্তাররা বলেন, এখানে কিছু হবে না।

ওঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে নিয়ে যাও। টাকা নেই। কী ভাবে নিয়ে যাবে? বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হল। তার পর থেকে বিনা চিকিৎসায় ঘরেই পড়েছিলেন। বুদি কুজুর শেষ পর্যন্ত মারা যান। ছেলে সুধীর কুজুরকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমার মাকে ফেলে রাখলে? তার বক্তব্য, দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা নেই ঘরে। সেখানে অসুস্থ মাকে দেখব কী ভাবে? তাই চোখের সামনে তিলে তিলে মরতে দেখলাম মাকে। কিছুই করতে পারলাম না।

বুদিকে নিয়ে গত কয়েক মাসে বীরপাড়া চা বাগানে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হান্টাপাড়া চা বাগানে ১৫ দিনে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি ঘোষণা আছে। টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু যার প্রয়োজন তার কাছে সরকারি চাল পৌঁছয় না। পৌঁছলেও তা খাওয়ার উপযুক্ত নয়। চিকিৎসা পেতে গেলে দূরে যেতে হয়। তার জন্য রাস্তায় খরচ করার মতো অর্থই নেই। সেখানে বিনা চিকিৎসায় মরাটাই ভবিতব্য। এমন ঘটনা চা বাগান বন্ধের আগেও হয়েছে। ২০০৬-'০৭-এ মুজনাই চা বাগানে ৫৭১ জন অনাহারে মারা গেছে। এমন ঘটনাও আছে যেখানে সাত দিন অনাহারে কাটানোর পর দু'মাসের শিশুকে মা বিক্রি করেছেন।

এ সব মানবাধিকার হরণের ঘটনা নয়? ভারতীয় সংবিধানের ৩৯০এ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নাগরিকেরা যাতে সুস্থ ভাবে জীবনযাত্রা চালাতে পারে সেটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। এক জন নাগরিক আর্থিক বা অন্য প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে যাতে যথোপযুক্ত বিচার পায় তা রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তবে কেন শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে? কারখানা বন্ধ করার কারণ যা-ই থাক। হতেই পারে, মালিক আর চালাতে পারছেন না। সেটা ঠিক না বেঠিক সে সব পরের কথা। আইন মেনে সমস্ত শ্রমিককে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ, ক্ষতিপূরণ কেন দেওয়া হবে না? হাজার হাজার বন্ধ কারখানায় এ জিনিস ঘটলেও সরকার কেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে আইনি দায়িত্ব, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা পালন করে না? প্রশ্ন এটা নয়। শ্রমিকরা কারখানা, সংস্থা, বাগান

বন্ধে অর্ধাহারে-অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় আছেন। যেন মড়ক লেগেছে। খবরে আর কতটুকু বেরোয়? এত বড় দেশ, এত টাকা কারণে-অকারণে খরচ হয়। এই সব মানুষের জন্য একটু মাথা গোঁজার ভদ্রস্থ ব্যবস্থা, দু'বেলা পেটপুরে খাবার ব্যবস্থা, শিশুদের দুধ, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া— এ সবের ব্যবস্থা করা যায় না, এটা আমি মানি না।

শুধু এটাই নয়, প্রায় চার দশক ধরে বাংলার একটা প্রজন্মের শ্রমিকের 'দক্ষতা'র যে ভাবে মৃত্যু ঘটল তার কোনও হিসাব হল না। যে বেণী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শ্রমিক অত্যন্ত উন্নতমানের জেনারেটর তৈরি করতেন, অ্যাসল্ট রাইফেলের যন্ত্রাংশ তৈরি করতেন, যে শ্রমিক রেলওয়ে সিগন্যালিংয়ের যন্ত্র বানাতেন, ভিগাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে শ্রমিক বিমানের যন্ত্র বানাতেন— তাঁদের অনেকেরই শিক্ষা পরম্পরাগত লোকায়ত শিক্ষা। যা হেডমিস্ত্রির কাছে কানমলা খেয়ে, চড়চাপড় খেয়ে 'ছাত্র' হিসেবে শেখা। এ সব অর্জিত দক্ষতালব্ধ শ্রমিক স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য সব্জির ভেন্ডার, রেলের কামরায় আমলকী, লজেন্স বিক্রেতা। কেউ কেউ চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই 'দক্ষতা'র মৃত্যু 'প্রজন্মের' বিশ্বাস ভেঙেছে, বাংলার অনেক কিছুকেই নস্যাৎ করেছে। এটা কেন মানুষের মতো বেঁচে থাকার মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনা হবে না?

এ বার আসুন অন্য বিষয়ে। আমার না শোনার অধিকার আছে। শব্দতাণ্ডবের বিরুদ্ধে, শব্দযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হাইকোর্ট ১৯৯৭ সালে এক রায় দিল। ভয়ঙ্কর শব্দের প্রতিবাদ করলেন দীপক দাস। প্রায় এক দশক আগের ঘটনা। তাঁকে খুন হতে হল। এ ভাবেই মারা গেলেন গত পনেরো বছরে আট জন নানান বয়সের মানুষ। নিহতদের অপরাধ, তাঁরা আইন মেনে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদেরও 'বন্দি শ্রোতা' না হওয়ার অধিকার আছে, সেটাই জানিয়েছিলেন। আজ সবাই আকাশের 'তারা' হয়ে গেছেন। দুঃখের কথা, এক

জন অপরাধীও শাস্তি পায়নি। সংবিধান ভিত্তি গড়ে। রাষ্ট্র আইন তৈরি করে। বিচারপতি ব্যাখ্যা দেন। তবু মানবাধিকার রক্ষিত হয় না।

৬ অগস্ট ২০১৫। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভেদকর জানালেন, দশ বছরে অত্যধিক বায়ুদূষণের কারণে ভারতে ৩৫ হাজার মানুষ শ্বাসনালিতে প্রচণ্ড সংক্রমণজনিত অসুখে ভুগে মারা গেছে। প্রতি বছর ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বায়ুদূষণের কারণে এই অসুখে ভুগছে। আমরা আতঙ্কিত এটা জেনে যে পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় ভুক্তভোগী মানুষ সংখ্যায় বেশি। ২০১৪-এ রাজ্যে ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৬২৩ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এই অসুখে। এবং ৬২৫ জন এক বছরে মারা গেছেন। ২০১১ থেকে ২০১৪, এই ক'বছরে পশ্চিমবঙ্গে শুধু এই রোগে মারা গেছেন ২৬৬২ জন। রাজ্যসভায় বক্তব্য জানার পর লিখিত ভাবে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মন্ত্রীর দেওয়া বয়ানটি কতটা সত্যি! কোনও উত্তর আসেনি।

উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ ব্লকে কয়েকটি গ্রাম থেকে প্রায় ২০০ জন কাজ করতে যান বর্ধমানের রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, কুলটি অঞ্চলের তিনটি কারখানায়। পাথরভাঙা কলে ২০১০ থেকে ২০১৩, কাজ করতে করতে 'সিলিকোসিস' রোগে আক্রান্ত হন। আজ প্রায় ৫০ জন মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছেন, সর্বক্ষণ অক্সিজেন নিয়ে শুয়ে আছেন। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কয়েকটি অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে দিয়েছিল। বেশ কয়েক বার চাল, ডাল, টাকা দিয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। ভয়ঙ্কর অবস্থা। গোয়ালদহ গ্রামের ১০ জন মারা গেছেন যাদের বয়স ১৯ থেকে ৩০-এর মধ্যে। এদের 'ডেথ সার্টিফিকেট'-এ লেখা আছে 'সিলিকোসিস', পেশাগত রোগে মৃত্যুর কথা। ঝুপাখালি, দেবীতলা, গান্ডি, জীবনতলা— এ সব গ্রামেও বেশ কয়েক জন মারা গেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ১৩ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়ে এবং চিকিৎসা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আবেদন করা হয়েছে। অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে ঘটনার জন্য কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার

কমিশনকে ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থানের সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের তরফে আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দেশ দেন, এদের বিষয়টি মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ধরে নিয়ে তদন্ত করে আদেশ দিতে হবে। এর পর রাজস্থান, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে নানা শ্রমিক সহায়ক গোষ্ঠী মানবাধিকার কমিশনে আবেদন করে। কমিশন ঝাড়খণ্ডে 'সিলিকোসিস' আক্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় যা ঝাড়খণ্ড সরকার কার্যকর করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২৫ জুলাই ২০১৪-য় 'সিলিকোসিস' নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে বলল, শ্রমিক বা কোনও ব্যক্তি সিলিকোসিসে আক্রান্ত হলে রাজ্যের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হল আশু এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত মানুষের জন্য চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

দলসিংহপাড়ার বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা।

যে কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়েছিল সে কারখানায় শ্রমিক রেজিস্টার-এ আক্রান্ত শ্রমিকদের নাম আছে কি নেই? আদৌ এই অসুখটা পেশাগত রোগ কি না? ক্ষতিপূরণের দায় কার? মালিক না সরকারের? চিকিৎসার দায়িত্ব কে নেবে? মালিক না সরকার? এ সব নিয়ে সরকারি জবাবি হলফনামা তৈরি হতে পারে? অনেক গবেষণা রিপোর্ট, বিশেষজ্ঞ মতামত থাকতে পারে। কিন্তু এটা বাস্তব যে মিনাখাঁ গ্রামের প্রায় ২০০টি পরিবার ও তাদের আত্মীয়-প্রিয়জনেরা বড় কষ্টে আছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষরা কেউ মৃত, কেউ মৃতপ্রায় শুয়ে আছে, দিন গুনছে।

আমাদের মানবাধিকার চর্চা কি শুধুই সাফাই আর একে অন্যের চাপনউতোরে রক্ষা পাবে?